বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ৪

একক ঃ ১—৩

একক ১ □ সংস্কৃতির সংজ্ঞা

গঠন

১.১ গোপাল হালদারের সমকালে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

১.২ গোপাল হালদারের জীবনী ও সাহিত্যচর্চা এবং 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' সম্পর্কিত আলোচনা

১.৩ গোপাল হালদারের প্রবন্ধ : সামগ্রিক পরিচয়

১.৪ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : রচনার পটভূমি ও বিশেষত্ব

১.৫ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : সারসংক্ষেপ

১.৬ সংস্কৃতির গোড়ার কথা

১.৭ গোপাল হালদার প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও লক্ষণ

১.৮ গঠন শিল্প : সংস্কৃতির সংজ্ঞা

১.৯ প্রশ্নাবলী

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১ গোপাল হালদারের সমকালে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

উনিশ শতকের শেষে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা পূর্ব পাঠে আলোচিত হয়েছে। বিশ শতকে যে সাহিত্যের সীমা হল বিস্তৃত।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের এবং চিন্তন জগতের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হল। ফলে গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মতো প্রবন্ধেও দেখা দিল পরিবর্তন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৮) এবং 'কল্লোল'-এ পরিবর্তনের ভূমিকা রচনা করেছিল। বিশেষত 'সবুজ পত্র' ইউরোপীয় সাহিত্যের মননসমৃদ্ধির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি মন হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক। রুশ বিপ্লব তার মনোভুবনকে নাড়া দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবীর পরিস্থিতির ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। বিশ শতকে বাঙালির পরিণত আত্মবিশ্বাসী মনোভুবন পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গি গিয়েছিল পালটে। সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব—সব দিকেই দেখা দিয়েছিল পরিবর্তন। প্রবন্ধ সাহিত্যেও পড়েছিল তার প্রভাব।

এ সময়ের প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি নতুন দিক সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ। সাম্যবাদের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটেছিল আগেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' তার প্রমাণ। দেশত্যাগী বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে রাশিয়ার তাসখন্দ-এ স্থাপন করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট দল। ক্রমে ভারতেও প্রসারিত হয় তার শাখা। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব এবং রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মনীষীগণ নবোৎসাহে সাম্যবাদ প্রচারে মন দিলেন। ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করল। তার ফলে কমিউনিজম-এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ল। ক্রমে অর্থনীতি, সমাজ-

ইতিহাস, সংস্কৃতি—সব বিষয়েই মার্কসবাদের তাত্ত্বিক প্রয়োগ লক্ষিত হল। শ্রেণিশোষণ আর শোষক-শোষিত শ্রেণির দ্বন্দ্বের দৃষ্টিতে বিচার করা হতে লাগল দেশ ও জাতির ইতিহাস।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস বাংলায় রচনার প্রবণতা বাড়তে লাগল।

এই পটভূমিতে বিশ শতকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে দেখা দিল মোটামুটি দুটি প্রবণতা—(ক) সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনা, (খ) মননপ্রধান পাশ্চাত্য-চিন্তন প্রভাবিত প্রবন্ধ। তার সঙ্গে ছিল আত্মগত নিবন্ধ বা রম্য রচনার পূর্বগত ধারা। সেধারাটিও বিশ শতকের তিরিশের দশকে পুষ্ট হয়েছিল।

(ক) **সাহিত্য-সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ**—এ ধারার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মুহদ শহীদুল্লাহ্, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু।

(খ) **মননপ্রধান পাশ্চাত্য-চিন্তন প্রভাবিত সমকাল-সচেতন প্রবন্ধ ধারা**—কাজী আবদুল ওদুদ এই ধারার প্রাবন্ধিক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রেজাউল করীম, সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিনয়কুমার সরকার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিপ্রধান লেখক এই ধারার প্রাবন্ধিক।

দুই ধারার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও কাজী আবদুল ওদুদ পাঠক্রমভুক্ত প্রাবন্ধিক হওয়ায় তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করা হয়নি।

(ক) সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ ধারা :

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) : অতুলচন্দ্র গুপ্ত খুব কমই লিখেছেন। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৯২৮) নামের ক্ষুদ্র প্রবন্ধগ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত এবং নিটোল আলোচনা তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার স্পষ্টতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষ গুণ। 'নদীনীরে' তাঁর ভ্রমণনিবন্ধ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র প্রথম প্রবন্ধ 'মদনভস্ম' ('ভারতী' অগ্রহায়ণ ১৩১৬ ব.)। তিনি 'আল এসলাম' (১৯১৫) 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' (১৯১৮) 'আঙুর' (প্রথম মুসলিম শিশু পত্রিকা), 'দ্য পিস' (১৯২২-১৯৩০), মাসিক 'বঙ্গভূমি' (১৯২২), পাক্ষিক 'তকবীর' (১৯৪৭)—এইসব পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা সূত্রে যুক্ত ছিলেন।

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাই শহীদুল্লাহ্র প্রধান কাজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান নিয়ে তাঁর পূর্বে আর কেউ এমন বিশদ বিশ্লেষণ করেননি। ধর্মের তুলনাত্মক আলোচনাভিত্তিক বহু প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম ১৯৫৩, ২য় ১৯৬৫) রচনা। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৩১—শহীদুল্লাহ্-র ১ম প্রবন্ধ সংকলন), 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯), 'ইসলাম প্রসঙ্গ', 'কুরআন' প্রসঙ্গ (মরণোত্তর প্রকাশনা)। বাংলা প্রবন্ধের ইসলাম সম্পর্কিত শাখাটিকে পুষ্ট করেছিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র প্রবন্ধ।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮১-১৯৫২) ছিলেন প্রাচীনপন্থী সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ ভিন্ন কয়েকটি সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন।

সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৩৬) সংকলনের তেরোটি প্রবন্ধে মোহিতলাল মূলত উনিশ শতকে বাংলা কাব্য-কবিতা, উপন্যাস প্রবন্ধের উদ্ভব-কারণ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। 'সাহিত্য কথা' (১৯৩৮)-র চোদ্দোটি প্রবন্ধে আছে সাহিত্যের

আদর্শ, সমস্যা বিষয়ক আলোচনা। 'সাহিত্য-বিজ্ঞান' (১৯৪২)-এর পঁচিশটি প্রবন্ধে আছে বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি, হাস্যরস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা। এইসব প্রবন্ধ তাঁর সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের প্রমাণ দেয়। 'সাহিত্য-বিচার' (১৯৪৭) তাঁর এ শ্রেণির আর একটি গ্রন্থ। তাঁর ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৪৫)। 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৪৭), 'বঙ্কিমবরণ' (১৯৪৯), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৬১), 'রবিপ্রদক্ষিণ' (১৯৪৯), 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য' (১ম ১৯৫২, ২য় ১৯৫৩),—এই সব প্রবন্ধ-সংকলনে তিনি সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকগণের রচনা-বিশেষত্ব ও সাহিত্যিক-সত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন।

'বাংলার নবযুগ' (১৯৪৫), 'বাংলা ও বাঙালী' (১৯৫১), 'জীবন জিজ্ঞাসা' (১৯৫১)—তাঁর সমাজভাবনামূলক প্রবন্ধের সংকলন। 'বাংলার নবযুগ'-এ তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মানবতাবাদই ছিল উনিশ শতকে বাঙালির নব জাগরণের ভিত্তি। 'জয়তু নেতাজী' এবং 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' (১৯৬২) মোহিতলালের জীবনীপ্রবন্ধের নিদর্শন।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাহিত্য-সমালোচকে মোহিতলালের প্রবন্ধ সমূহ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সমালোচনা ধারাটিকে পুষ্ট করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের বিশিষ্ট আলোচক **সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮)**-র অধিকাংশ প্রবন্ধই ইংরেজিতে লেখা। পুঁথি, শিলালেখ—প্রভৃতির সাহায্যে সংস্কৃত আলংকারিক কুন্তকের কাল নির্ণয় এবং অভিনব গুপ্ত কৃত 'ধ্বন্যালোক'-এর 'লোচন' টীকার সম্পাদনা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৪৭) সংকলন গ্রন্থটি সুশীলকুমারের বাংলা বিদ্যা চর্চার মূল্যবান নিদর্শন। তাঁর বাংলা প্রবন্ধ-গ্রন্থ মাত্র দুটি—'দীনবন্ধু মিত্র' (১৯৫১) (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা হিসেবে রচিত) এবং 'নানা নিবন্ধ' (১৯৫৩ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন)। ঈষৎ রক্ষণশীল মানসিকতা-সম্পন্ন লেখক সুশীলকুমার দে-র প্রবন্ধের বিশেষত্ব যুক্তি ও তথ্যের বিন্যাস-সৌষম্য।

ভাষাতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭০)** ভাষা, সংস্কৃতি, ভ্রমণ—প্রভৃতি বিষয়েও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বেশির ভাগ প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখলেও বাংলায়ও বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন সুনীতিকুমার। তাঁর লেখা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা তিন—'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' (১৯১৯), 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' (১৯৪৪) এবং 'বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে'।

'জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য' (১৯৩৮), 'ভারত-সংস্কৃতি' (১৯৪৪), 'সাংস্কৃতিকী' (১ম খণ্ড ১৯৬২, ২য় খণ্ড ১৯৬৫, ৩য় খণ্ড ১৯৮২), 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' (১৯৭৬) এবং 'বাঙালীর সংস্কৃতি' (১৯৯০)—তাঁর সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন।

'পশ্চিমের যাত্রী' (১৯৩৮), 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' (২য় সংস্করণ ১৯৬৫), 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৯৪৭), 'ইউরোপ' (১ম খণ্ড ১৯৪৪, ২য় খণ্ড ১৯৪৫), 'পথ-চলতি' (১ম ১৯৬২, ২য় ১৯৬৪)—এগুলি তাঁর ভ্রমণ-নিবন্ধ। 'মনীষী স্মরণে' (১৯৭২) এবং 'জীবন-কথা' (১৯৭৯ মরণোত্তর প্রকাশনা) তাঁর স্মৃতিচিত্রমূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

প্রজ্ঞার দীপ্তি, ভাষার প্রাঞ্জলতা, সরল বক্তব্য উপস্থাপন ভঙ্গি—সুনীতিকুমারের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) : ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেছিলেন। রোমান্টিক গোষ্ঠীর সাহিত্য-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধই লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩৯)। গ্রন্থটি বাংলা কথাসাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনার পথপ্রদর্শক। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৪৬), 'বাংলা উপন্যাস' (১৯৪৭), 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (১৯৫৯), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ-সঙ্গমে' (১৯৬২), 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা' (১ম ১৯৬৫, ২য় ১৯৬৯)।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-আলোচনার ভিত্তি ছিল সাহিত্যের অন্তর্গত জীবনদর্শনের সন্ধান। সংবেদনশীলতা

ও মননের সমন্বয় তাঁর সাহিত্য-আলোচনার বৈশিষ্ট্য। গভীর উপলব্ধি এবং সময়চেতনা যে সার্থক সাহিত্যের ভিত্তি—এ সত্যও তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় উপেক্ষিত হয়নি।

তবে বিশ শতকের নতুন রীতির সাহিত্যের তাৎপর্য তিনি তেমন অনুভব করতে পারেননি। জটিল বাক্যবিন্যাস এবং কিছু শব্দের পৌনঃপুনিকতা তাঁর সাহিত্য-সমালোচনাকে কিছুটা দুর্বল করেছে বলা যায়।

ঈষৎ প্রাচীনপন্থী হলেও **সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)** ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ইতিহাসের বিশিষ্ট পণ্ডিত। তাঁর প্রধান কাজ চার খণ্ডে বিভক্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০-১৯৫৫) এবং বাংলা ভাষা সংক্রান্ত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯) গ্রন্থ।

বাংলা বিদ্যাচর্চায় নিপুণ সুকুমার সেন নানা বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম করা যায়। যেমন 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০), 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' (১৯৪৩), 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' (১৯৪৫), 'বনফুলের ফুলবন' (১৯৫১), 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ' (১৯৬২), 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' (১৯৭০), 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' (১৯৭৭), 'ভারত কথার গ্রন্থিমোচন' (১৯৮১), 'গল্পের ভূত' (১৯৮২), 'চৈতন্যাবদান' (১৯৮৫), 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' (১৯৮৮), 'দিনের পরে দিন' ('স্মৃতিকথা' ১ম ১৯৮২, ২য় ১৯৯৩) প্রভৃতি।

তথ্যের যুক্তি সংগত বিন্যাস, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং আকর্ষক সরল ভাষা সুকুমার সেনের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) মূলত সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তবে কয়েকটি ব্যঙ্গ-তির্যক নিবন্ধ, আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ এবং জীবনীও তিনি রচনা করেছিলেন।

তথ্যসন্ধিৎসু গবেষক মনের অধিকারী প্রমথনাথের বেশির ভাগ প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচিত রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা মূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে—'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ' (১৯৩৯, লেখকের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন। পরে এটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়; ১ম খণ্ড ১৯৪৮, ২য় খণ্ড ১৯৪৯), 'রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর' (১৯৫৬), 'রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ' (১ম ১৯৫৩, ২য় ১৯৫৮), 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৯৫৪), 'মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), 'রবীন্দ্রসরণী' (১৯৬২) এবং 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭২) প্রভৃতি।

তাঁর অন্যান্য সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে উল্লেখ্য 'বঙ্কিম সরণী' (১৯৬৩), 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' (১৯৬৬), 'বঙ্কিম সাহিত্য বিচার' (১৯৭০), 'বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৮৪) প্রভৃতি।

তাঁর রচিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য 'মাইকেল মধুসূদন' (১৯৪১), 'বাংলার লেখক' (১৯৫০), 'জওহরলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' (১৯৫১), 'বাংলার কবি' (১৯৫৯), 'গান্ধী জীবনভাষ্য' (১৯৭১) প্রভৃতি। 'বিচিত্র উপল' (১৯৫১), 'নানা রকম' (১৯৫৮), 'বিচিত্র সংলাপ' (১৯৫৮), 'কমলাকান্তের আসর' (১৯৫৫), 'কমলাকান্তের জল্পনা' (১৯৬২)—প্রভৃতি গ্রন্থ প্রমথনাথ বিশীর লেখা বিভিন্ন রসের প্রবন্ধ-সংকলন। সাহিত্যবোধ, সাহিত্যজ্ঞান এবং সৃষ্টিপ্রতিভার সংমিশ্রণ, প্রমথনাথ বিশীর মননদীপ্ত এবং আকর্ষক প্রবন্ধসমূহের বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ছন্দ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পথিকৃৎ **অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২-১৯৮৪)** স্মরণীয় কাজ বাংলা ছন্দ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (১৯৩২)। সুকুমার সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অমূল্যধন-প্রদত্ত ছন্দ-পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ছন্দে পর্ব-পর্বাঙ্গ বিভাগের প্রথম প্রবক্তা অমূল্যধনের অন্যান্য ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ্য 'রবীন্দ্রছন্দের বৈশিষ্ট্য' (আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা', ১৯৬১ গ্রন্থের প্রবন্ধ), 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি' ('কবিগুরু' ১৯৬৪)।

বাংলা সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই সব প্রবন্ধের সংকলন 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' (১৯৬১), 'কবিগুরু' (১৯৬৪), 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' (১ম খণ্ড ১৯৬১, ২য় খণ্ড ২০০০) গ্রন্থ তিনটি।

সহজ ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনা অমূল্যধনের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) : সাহিত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি নিয়ে বহু বিশ্লেষণভিত্তিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'চতুরঙ্গ', 'বারোমাস', 'ক্রান্তি' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত প্রবন্ধ-রচয়িতা নীহাররঞ্জনের মূল্যবান গ্রন্থ পনেরো অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' (১৯৪৯) গ্রন্থটি। বাংলা ও বাঙালি জীবনের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ' (১৯৪৫), 'প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন' (১৯৪৭), 'বাংলার নদনদী', 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' (১৯৭৯)। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১)—রবীন্দ্রসাহিত্য-সংক্রান্ত এই প্রবন্ধ-সংকলনে নীহাররঞ্জন রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তনের সময়ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। ভাষার স্পষ্টতা তথ্যের সুচারু বিন্যাস, মননের ভারহীন উদ্ভাস নীহাররঞ্জন রায়ের প্রবন্ধের বিশেষ গুণ।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) ছিলেন গবেষণা-ভিত্তিক প্রবন্ধের দক্ষ রচয়িতা। বেশির ভাগ প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখলেও তাঁর বাংলা প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা কম নয়। ধর্ম, দর্শন আর সাহিত্য—তিন বিষয়েই বেশ কিছু বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন শশিভূষণ। তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব গভীর পাঠজনিত জ্ঞান এবং মৌলিক চিন্তনশক্তির সুমিত অন্বয়। 'বাংলা সাহিত্যে নবযুগ' (১৯৩৮), 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' (১৯৪৫), 'শ্রীরাধার ক্রম বিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' (১৯৫২), 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', 'ঘরে বাইরের সাহিত্যচিন্তা' (১৯৬২) শশিভূষণ দাশগুপ্তের স্মরণীয় প্রবন্ধ-সংকলন।

(খ) মননপ্রধান, প্রতীচ্য চিন্তন-প্রভাবিত সমকাল সচেতন প্রবন্ধধারা :

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) ছিলেন 'সবুজপত্র'-ধারার মননদীপ্ত প্রবন্ধ-রচয়িতা। সংগীত, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি—প্রায় সব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন মার্কসবাদে আস্থাশীল সমকালের রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ধূর্জটিপ্রসাদ। বিষয়-বিস্তৃতি, যুক্তিপ্রাধান্য, নিরাসক্ত বিশ্লেষণ প্রবণতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রবন্ধের লক্ষ্য পাঠকের অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচন। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা সাত। এদের মধ্যে 'চিন্তয়সি' (১৯৩৪), 'বক্তব্য' (১৯৫৭) বিষয়-গভীর প্রবন্ধের সংকলন। 'সুর ও সংগীত' (১৯৩৭) ও 'কথা ও সুর' (১৯৩৮)—সংগীতকেন্দ্রিক প্রবন্ধের সংকলন। 'আমরা ও তাহারা' (১৯৩১), 'মনে এলো' (১৯৫৬) এবং 'ঝিলিমিলি' (১৯৬৫)—বুদ্ধিদীপ্ত রম্য প্রবন্ধের সংকলন। তাঁর প্রবন্ধভাষার বিশেষত্ব বুদ্ধি-উজ্জ্বল বাক্যের ব্যবহার।

সাহিত্য দর্শন, রাজনীতি এবং মার্কসবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল **নীরেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৯৬-১৯৬৬)** চিন্তন-ধারা। 'পরিচয়'-এ দেশবিদেশের প্রসিদ্ধ লেখকদের নিয়ে তিনি লিখেছিলেন বহু প্রবন্ধ। সেইসব প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন মহৎ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রগতিমনস্কতা থাকেই। তাঁর প্রবন্ধের আর এক বিশেষত্ব শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সাহিত্য-রূপের বিশ্লেষণ। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি মার্কসীয় এই তত্ত্বের প্রয়োগে বিচার করেছেন। মার্কস-এর তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তাঁর একটি মাত্র প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'সাহিত্যবীক্ষা'।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ছিলেন মননশীল প্রবন্ধ ধারার লেখক। তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বুদ্ধিবৃত্ত বাংলা ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (১৯৩১)। এ পত্রিকা পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও মননচর্চার সঙ্গে বাঙালি মনের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল।

সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা মাত্র দুটি—'স্বগত' (১৯৩৮) এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭) প্রথম সংকলনের আঠারোটি প্রবন্ধের বিষয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক। 'কুলায় ও কালপুরুষ' সংকলনের উনিশটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি 'স্বগত' (১ম সংস্করণ) থেকে গৃহীত। এ সংকলনে মানবস্বভাব, বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে রচিত কিছু প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

চিন্তার গভীরতা, বহুপাঠ জনিত অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ মেধা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, শ্রমশীল রচনাক্ষমতা, প্রখর শব্দচেতনা, সংহত বহু স্তর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি—সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

রেজাউল করীম মহম্মদ জওয়াদ (১৯০২-১৯৯৩) : রেজাউল করীম নামেই পরিচিত। তাঁর প্রবন্ধে লক্ষিত হয় জাতীয়তা চেতনা ও ধর্মীয় উদারতার প্রকাশ। ধর্মীয় সমন্বয় সাধন এবং স্বদেশের বৌদ্ধিক মুক্তি ছিল তাঁর প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য। ইংরেজি ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ করেছেন তিনি। 'জাতীয়তার পথে' (১৯০৯), 'নয়া ভারতের ভিত্তি' (১৯৩৫), 'তুর্কি বীর কামাল পাশা' (১৯৩৮), 'পাকিস্তান বিচার' (১৯৪২), 'সাধক দারাশুকো' (১৯৪৪), 'মনীষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ' (১৯৪৭), 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধিজী (১৯৪৭), 'সংস্কৃতি সমন্বয়' (১৯৪৭)—এই কয়টি তাঁর বাংলা প্রবন্ধের সংকলন।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ছিলেন বহু ভাষাবিদ, প্রশ্নাতীত পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্রাবন্ধিক। তিনি বিষয়-গভীর প্রবন্ধ, রম্য রচনা, ভ্রমণ নিবন্ধ—তিন ধরনের প্রবন্ধই লিখেছেন। তবে ঈষৎ শৃঙ্খলাহীন অনুভব-প্রধান রম্য নিবন্ধ-রচয়িতা হিসেবেই তিনি খ্যাত। রম্য নিবন্ধের লঘু কাঠামোয় গভীর বিষয়ের অনায়াস বিন্যাসে তিনি ছিলেন দক্ষ। ভাষা, সহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, ব্যক্তিজীবন—সর্ব বিষয়ে প্রাঞ্জল, আন্তরিক ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন মুজতবা আলী। তাঁর বহু প্রবন্ধই সমকালীন ঘটনার অভিঘাতে রচিত। কিন্তু উপস্থাপন-কৌশলে সেগুলি হয়ে উঠেছে চিরকালীন। মননের হৃদয়গ্রাহী প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের আছে 'পঞ্চতন্ত্র' (১ম খণ্ড ১৯৫২, ২য় খণ্ড ১৯৬৬), 'ময়ূরকণ্ঠী' (১৯৫৩), ' পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৯৫৬), 'ধূপছায়া' (১৯৫৮), 'চতুরঙ্গ' (১৯৬০), 'বহু বিচিত্র' (১৯৬২), 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' (১৯৬৫), 'বড়বাবু' (১৯৬৫), 'হিটলার' (১৯৭১), 'মুসাফির' (১৯৭১) প্রভৃতি। তাঁর ভ্রমণ-নিবন্ধ 'দেশে-বিদেশে' (১৯৪৯) ও 'জলে-ডাঙায়' (১৯৫৭) প্রভৃতি।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) : ভ্রমণ কথা ভিন্ন নানা বিষয়ে প্রচুর বুদ্ধি-উজ্জ্বল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'পারিবারিক নারী সমস্যা' (১৯১৫) সমকালে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম পর্যায়ে সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ অধিক লিখলেও পরে তিনি রাজনীতি, জাতীয় সমস্যা, শিল্পতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম-সমস্যা ভাষা সমস্যা, স্মৃতিচিত্র—বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। স্বীয় মানবিকতাবাদী মনের প্রকাশ দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে। যুক্তিনির্ভর-বিশ্লেষণ, চিন্তার স্বচ্ছতা, বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি, উপস্থাপন ভঙ্গির বিচিত্রতা—তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সরল, শব্দ নির্বাচন ও বাক্যবিন্যাস সুন্দর। ছোটো ছোটো বাক্যে বক্তব্যের উপস্থাপন তাঁর বিশেষত্ব। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলনের নাম দেওয়া গেল—ভ্রমণকথা 'পথে-প্রবাসে' (১৯৩১), 'ফেরা' (১৯৬৫) ; আত্মবিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ 'বিনুর বই' (১৯৪৪), 'চক্রবাল' (১৯৭৮), 'সাতকাহন' (১৯৭৯) ; অন্যান্য প্রবন্ধসংকলন 'আর্ট' (১৯৪৪ থেকে ১৯৬৮-এই কুড়ি বছরে লেখা প্রবন্ধের সংকলন), 'দেশকালপাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১)—বইদুটি সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন। 'কণ্ঠস্বর' (১৯৫৪) পত্রপ্রবন্ধের সংকলন। 'সন্ধিক্ষণ' (১৯৯০) ও 'সেতুবন্ধন' (১৯৯৫) ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংকলন। 'শতাব্দীর মুখে' (২০০১) সংকলনে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ'—তাঁর রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ। সমকালের কয়েকজন মনীষী সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর রচিত প্রবন্ধের সংকলন 'আমার কাছের মানুষ'।

বিনয়কুমার সরকার (১৯০৫-১৯৫৯) সহজ ভাষায় সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি মার্কসীয় তত্ত্ব, শিল্পকলা—বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজ বিন্যাসে উচ্চ ও নিম্ন বর্গের সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণের দিকটি তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন বিনয়কুমার।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয়। এ পরিষদের মুখপত্র 'আর্থিক উন্নতি' তাঁর উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল। বেশ কিছু বিদেশি প্রবন্ধ-সংকলনের অনুবাদও তিনি করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন', 'হিন্দু সাহিত্যে প্রেম', 'একালের ধনদৌলত' (মার্কসীয় তত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা)। তাঁর অনুবাদ

প্রবন্ধের মধ্যে আছে বুকার টি. ওয়াশিংটন-এর রচিত 'আপ ফ্রম স্লেভারি' অবলম্বনে রচিত 'নিগ্রো জাতির কর্মবীর'। 'ধনদৌলতের রূপান্তর'-এর অবলম্বন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর তত্ত্বভিত্তিতে রচিত একটি ফরাসি গ্রন্থ। বিষয়ের নতুনত্ব এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিনয়কুমার সরকারের বিশেষত্ব।

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২)-এর প্রবন্ধের বিশেষত্ব চিন্তন-গভীরতা, যুক্তিপ্রাধান্য এবং আন্তরিক অনুভবের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবিতা বিষয়ে তিনি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিশ্লেষণমুখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষ অনুভূতি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের 'পরিচয়' পত্রিকার একটি সংখ্যায়। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা মাত্র তিনটি—'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮), 'পান্থজনের সখা' (১৯৭৩), 'পথের শেষ কোথায়' (১৯৭৭)। তাঁর রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের অনন্যতা রবীন্দ্র-চেতনায় অমঙ্গালের উদ্ভাস বিশ্লেষণে।

বিষয় উপস্থাপনের স্বাতন্ত্র্য, দার্শনিকসুলভ নিরাসক্তি, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ পদ্ধতি, অ-জটিল প্রকাশভঙ্গি, সুবোধ্য ভাষা আবু সয়ীদ আইয়ুবকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র এক প্রাবন্ধিক।

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) বিচিত্র বিষয়ে মননসমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বহু পাঠজনিত গভীরতা, সমাজ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। সাহিত্য, সাহিত্যিক, সাহিত্যতত্ত্ব, চিত্রশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন স্মৃতিচিত্রণমূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা করতেন বিষ্ণু দে। তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা নয়। এদের মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতা' (১৯৬৬) রবীন্দ্র-রচনার বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধমালা। 'যামিনী রায়' (১৯৭৭) জীবনভিত্তিক প্রবন্ধ। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২), 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য' (১৯৫৮) সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ-সংকলন। 'সেকাল থেকে একাল' (১৯৮০) স্মৃতিচারণাভিত্তিক প্রবন্ধ-সংকলন।

বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) প্রথম জীবনে ছিলেন সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী। 'ফরওয়ার্ড', 'সাপ্তাহিক অরণি', দৈনিক 'বসুমতী', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছিলেন তিনি। সমাজ-সংস্কৃতি, ব্যক্তিজীবন রাজনীতি, সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন বিনয় ঘোষ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর সমাজ-সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'শিল্প সংস্কৃতি সমাজ' (১৯৪০), 'সংস্কৃতির দুর্দিন' (১৯৪৫), 'বাংলার নবজাগৃতি' (১৯৪৮), 'কলকাতা কালচার' (১৯৫৩), 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) প্রভৃতি। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ-সংকলন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'।

তাঁর জীবনী গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৭, ৩য় খণ্ড ১৯৫৯)।

'আন্তর্জার্তিক রাজনীতি' (১৯৪১), 'ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ' (১৯৪২) প্রভৃতি তাঁর রাজনীতিমূলক প্রবন্ধ-সংকলন। 'জনসভার সাহিত্য' (১৯৫৫), 'মেহনত ও প্রতিভা' (১৯৭৮) তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (১-৫ খণ্ড; ১৯৬১-১৯৬৮) বিনয় ঘোষের বিশেষ কীর্তি।

'কালপেঁচা' ছদ্মনামে তিনি বেশ কিছু রম্য নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'কালপেঁচার নকসা' (১৯৫১), 'কালপেঁচার দু'কলম' (১৯৫২), 'কাল পেঁচার বৈঠক' (১৯৫৭)—গ্রন্থত্রয় তাঁর সেসব নিবন্ধের সংকলন।

বিনয় ঘোষ ছিলেন গবেষক মনোবৃত্তি সম্পন্ন সৃষ্টিসক্ষম প্রাবন্ধিক।

এই আলোচনা প্রমাণ করে কোন সমৃদ্ধ প্রবন্ধসাহিত্য-প্রেক্ষিতে গোপাল হালদারের প্রবন্ধচর্চার শুরু এবং বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

১.২ গোপাল হালদারের জীবনী ও সাহিত্যচর্চা এবং 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' সম্পর্কিত আলোচনা

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার বিদগাঁও-এ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি সীতাকান্ত হালদারের দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র গোপাল হালদারের জন্ম।

বাড়িতে ছিল সংস্কৃতিচর্চা ও দেশপ্রেমের আবহ। গোপাল হালদারের প্রথম পাঠ পরিবারেই শুরু হয়। পরে জীবিকার সন্ধানে তাঁদের পরিবার নোয়াখালি শহরে চলে যান। সীতাকান্ত ও তাঁর বড়ো ভাই অন্নদাকান্ত একত্রে থাকতেন। অন্নদাকান্তের পুত্র পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ মনীষী ও মনস্তত্ত্ববিদ রঙিন হালদার।

শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবন : ১৯০৯ সালে গোপাল হালদার আর. কে. জুবিলি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনা পড়েছিলেন। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের লেখা। সমকালের অন্যান্য উজ্জ্বল ছাত্রের মতো গোপাল হালদারকেও টেনেছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। চোদ্দো বছর বয়সে নবম শ্রেণির ছাত্র গোপাল হালদার যুক্ত হয়েছিলেন বিপ্লবী দল 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে। তবে এ যোগ তেমন গভীর হয়নি বলেই মনে হয়। ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে আই. এ. শ্রেণিতে ভরতি হন। থাকতেন স্কটিশ চার্চ নিয়ন্ত্রিত ওগিলভি হস্টেল-এ। এখানে তাঁর পরিচয় হয় সজনীকান্ত দাস ও পরিমল রায়ের সঙ্গে। এই তিন জন সাহিত্যচর্চার একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। তবে তাঁর নিয়মিত পাঠ বাধা পায়নি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করে তিনি এই কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়া শুরু করেন। এসময় গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে তিনি পরীক্ষা না দিয়ে যোগ দেন কংগ্রেসে—এবং চলে যান নোয়াখালি। কিন্তু এ সময় বিহারের চৌরিচৌরায় উত্তেজিত জনতা পুলিশে ভরতি থানায় আগুন দিয়ে কয়েকজন কনেস্টবলকে হত্যা করে। ফলে গান্ধিজি আন্দোলন থামিয়ে দেন। হতাশ গোপাল হালদার ফিরে আসেন কলকাতায় এবং পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে অনার্স সহ পাস করেন। তবে তিনি কংগ্রেস ছাড়েননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পড়ার সময় ১৯২৩-এ দিল্লির কংগ্রেস অধিবেশনে ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন তিনি। এসময় কংগ্রেসে দেখা দিয়েছিল বহু মতবিরোধ। ফলে কংগ্রেসি রাজনীতি সম্পর্কে ক্রমে তাঁর মন হয়ে ওঠে সংশয়ী। এর মধ্যে তিনি এম. এ. (১৯২৪) ও আইন (১৯২৫) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি লাভ করেছিলেন 'টেগোর ল অ্যাওয়ার্ড'। বি. সি. এস. পরীক্ষার পাশ করলেও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি নোয়াখালি গিয়ে আইন ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মন টানত সাহিত্য ও রাজনীতি। নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন আর দাঙ্গার ক্রম-ব্যাপ্তিতে উদ্বেগ বোধ করতেন গোপাল হালদার। এর মধ্যে ১৯১৭ সালে ঘটেছে রুশ বিপ্লব। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কমিউনিজম প্রচারের প্রয়াস স্বরূপ 'ভ্যানগার্ড' ও 'অ্যাডভ্যান্সড গার্ড' পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশের বাণী' সংবাদপত্রটি ছিল স্বরাজ্য দলের সমর্থক। এ পত্রিকায় উক্ত দুই পত্রিকার সংবাদ উদ্ধৃত হত। ১৯২৫-এ কানপুরে স্থাপিত কমিউনিস্ট দল আর সোভিয়েত রাষ্ট্রসংক্রান্ত সংবাদ মুদ্রিত হত এই পত্রিকাটিতে। এভাবেই সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জাগতে থাকে গোপাল হালদারের মনে।

১৯২৬-এ তিনি আবার কলকাতায় আসেন এবং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ করেন 'পূর্ব বঙ্গের উপভাষা' নিয়ে গবেষণা। কলকাতার সাহিত্য-জগতে তাঁর পরিচিতি বেড়ে যায়। বন্ধুত্ব হয়

সুশীলকুমার দে, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কালিদাস নাগ, মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয় তাঁর। ১৯২৭-এ তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ার'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

তখন রাজনীতির সঙ্গে তেমন যোগ ছিল না তাঁর। যদিও ১৯২৮-এ কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি রূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১৯২৯-এ পূর্ববঙ্গের ফেনি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন গোপাল হালদার। ১৯৩০ সালে তিনি পদত্যাগ করেন এবং কলকাতায় এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে ভারতের রাজনীতি জগৎ খুবই উত্তপ্ত ছিল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস রূপে ঘোষণা করে কংগ্রেস। সে বছরের মার্চ মাসে গান্ধিজির নেতৃত্বে শুরু হয় লবণ সত্যাগ্রহ। গোপাল হালদার গবেষণা ছেড়ে যোগ দিলেন আন্দোলনে। এই বছর সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া যান আর নভেম্বর মাস থেকে 'প্রবাসী'-তে বের হতে থাকে 'রাশিয়ার চিঠি'। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে গোপাল হালদারের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

১৯৩২-এ হয় 'গান্ধি-আরউইন' চুক্তি। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ হত্যা করেন ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স-কে, হিজলি জেলে পুলিশের গুলি চলে আর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে প্রতিবাদসূচক বক্তৃতা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয় গোপাল হালদারের।

প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আইনে কংগ্রেস-সদস্য হিসেবে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন গোপাল হালদার। বিচারে ছ-বছরের কারাদণ্ড হয় তাঁর। প্রথমে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়; পরে পাঠানো হয় বক্সা ক্যাম্পে। আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এই জেলে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে নিজের বাড়িতে অন্তরীন করা হয়। জেলে থাকার সময় তাঁর সাহিত্যচর্চার বিকাশ; আরব্ধ গবেষণা-কর্মও তিনি জেলে বসেই শেষ করেন।

এই সময়ে ফ্যাসিবাদের উত্থানে বিশ্বের বিবেকী ব্যক্তিগণ হন বিচলিত; সম্মিলিত প্রতিবাদ ঘোষিত হয়, সমাজতন্ত্রীগণ সংঘবদ্ধ হন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। ভারতেও দেখা যায় এর প্রতিফলন। প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই প্রেক্ষিতে বন্দী গোপাল হালদার সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তা ও পাঠ শুরু করেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত গোপাল হালদার পরিচিত হন সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে; যুক্ত হন 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামের ইংরেজি সাপ্তাহিকটির সঙ্গে। এবছরই কমিউনিস্ট দল পরিচালিত 'কৃষক সভা'র সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়।

১৯৩৯-এ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'-র তৃতীয় অধিবেশনের প্রচারসচিব হন গোপাল হালদার। এ বছরের ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। পরের বছর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এবছরই অর্থাৎ ১৯৪০ সালে গোপাল হালদার কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড'—এই দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। ১৯৪১-এ তিনি কমিউনিস্ট দলের সদস্য হন।

কমিউনিস্ট সদস্য হিসেবে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র সংগঠকদের একজন গোপাল হালদার সংগঠনের মুখপত্র 'সোভিয়েত দেশ'-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ক্রমে কমিউনিস্ট দলের প্রথম শ্রেণির নেতা হয়ে উঠেছিলেন গোপাল হালদার। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন। ১৯৪২-এ সোমেন চন্দের হত্যার প্রেক্ষিতে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন গোপাল হালদার। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর-কালে

কমিউনিস্ট দল দুর্গত ত্রাণের কাজ শুরু করেন। গোপাল হালদার এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। তারই ফল তাঁর তিন পর্বের উপন্যাস 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরশ পঞ্চাশ' ও 'ঊনপঞ্চাশী'। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এসময়ে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার পাসপোর্ট না দেওয়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি।

১৯৪৪-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ'-এর দ্বিতীয় সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর একজন ছিলেন গোপাল হালদার।

১৯৪৪-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্ব-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকাটির স্বত্ব প্রদান করেন তাঁর সাম্যবাদী বান্ধবদের কাছে। পত্রিকাটির দায়িত্ব পড়ে নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র মজুমদারের হাতে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮—এই চার বছর তিনি 'পরিচয়' সম্পাদনা করেন। ১৯৪৪-এ কলকাতায় গণনাট্য সংঘ গঠিত হয়। এই সংস্থার উদ্যোগে অভিনীত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের ছোটো এক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোপাল হালদার। এ ছাড়া কমিউনিস্ট দলের প্রায় সব সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কাজেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট দল ভারত সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। পরিণতিতে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ হয়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোপাল হালদারও বন্দী হন। ১৯৪৯-এর জুন মাসে তিনি মুক্তি পান।

সাম্যবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী হলেও কোনো গোঁড়ামি ছিল না গোপাল হালদারের। তিনি ছিলেন উদারমনা মানবতাবাদী। ক্রমে তিনি (১৯৪৮-এর পর) দলের সক্রিয় কর্মপ্রণালী থেকে সরে যান এবং জ্ঞানচর্চায় নিরত হন। ১৯৫১ সালে আবার তিনি 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হন। ১৯৬৭ সালে সম্পাদনা ভার ত্যাগ করলেও আ-মৃত্যু তিনি পত্রিকাটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেট ও সিন্ডিকেট সদস্য (১৯৫২-৫৭) থাকাকালে তিনি বাংলা-বিহার সংযোগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লখনউ অধিবেশনে সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি ছিলেন গোপাল হালদার। ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৮—এই তিনবার তিনি বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বিদেশের নানা সম্মেলনে গোপাল হালদার যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে সুইডেন-এর স্টকহোল্‌ম-এ আয়োজিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেস-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এরপর যোগ দিয়েছিলেন মস্কো-র স্লাভিস্ত কনফারেন্স ও তাসখন্দ-এ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে। এবছরই তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিন যান। ১৯৬০ ও ১৯৬২-তে মস্কোর ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স ও বিশ্বশান্তি সম্মেলনেও তিনি আমন্ত্রিত সভ্য হিসেবে যোগ দান করেন।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০—এই সময়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাহিত্য ও শিল্পকলা বিভাগের নির্বাচিত ফেলো হিসেবে কাজ করেছিলেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর গোপাল হালদারের মৃত্যু হয়।

সাহিত্য চর্চা—বেশির ভাগ বাঙালি সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। গোপাল হালদারের প্রথম মুদ্রিত রচনা একটি প্রবন্ধ এবং সে প্রবন্ধের বিষয় রাজনীতি। অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে লেখা 'বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২১) মাঘ সংখ্যা 'সবুজ পত্র' পত্রিকায়। যেন তাঁর সাহিত্য জীবনের একটি রেখাচিত্র এখানে আঁকা হয়েছিল। ১৯২৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ ও প্রফুল্ল হালদার ছদ্মনামে লেখা কিছু গল্প বের হয়েছিল।

এর পরে তিনি 'দেশের বাণী', 'প্রবাসী', 'ওয়েলফেয়ার' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিয়মিত বাংলা এবং ইংরেজিতে লিখতে থাকেন। 'দেশের বাণী'-তে মুদ্রিত হত গোপাল হালদারের রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ১৯২৬-এ ওই পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধের জন্য ব্রিটিশ সরকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করে। কারণ এ ব্যাপারে সরকার ও পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়েছিল প্রবন্ধটিতে। গোপাল হালদার বেশ কিছু উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাস ও প্রবন্ধ সংকলনের একটি তালিকা দেওয়া হল—

উপন্যাস : 'একদা' (১৯৩৯), 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫), 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬), 'ভাঙন' (১৯৪৭) : এ উপন্যাসের নতুন সংস্করণের নাম 'ভাঙনী কুল' (১৯৬৬), 'উজানগঙ্গা' (১৯৫০), 'অন্যদিন' (১৯৫০), 'স্রোতের দীপ' (১৯৫০), 'আর এক দিন' (১৯৫১), 'ভূমিকা' (১৯৫২), 'নবগঙ্গা' (১৯৫৩), 'জোয়ারের বেলা' (১৯৫৪), 'ত্রিদিবা' (১৯৭৮)—'একদা', 'অন্যদিন', 'আর এক দিন' এই তিন উপন্যাসের একত্রিত রূপের নাম। মন্বন্তর-কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস ভিন্ন বাকি ছ-টি উপন্যাসকে 'ভদ্রাসন' নামে পরে একত্রিত করা হয়।

ছোটো গল্প-সংকলন : 'ধূলিকণা' (১৯৪৮)। এছাড়া অনেক গল্প এখনও সংকলিত হয়নি।

প্রবন্ধ সংকলন : 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১), 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬), 'বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' (১৯৫৬), 'ভারতের ভাষা' (১৯৬৭), 'বাণিজ্য জিজ্ঞাসা' (১৯৬৯), 'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' (১৯৭২), 'সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' (১৯৭৮) 'জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষা সমস্যা' (পুস্তিকা) (১৯৮৫), 'প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর' (১৯৯১)

'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' (১৯৮৬)—এটি 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'—গ্রন্থ তিনটির সংকলন।

সাহিত্যের ইতিহাস : 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৫৮), 'বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা' (১৯৫৯), 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬১),

'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬৬), 'বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ' (১৯৮৬)।

রম্য নিবন্ধ : 'বাজে লেখা' (১৯৪২), 'আড্ডা' (১৯৫৬), 'বন চাঁড়ালের কড়চা' (১৯৬০)—'স্বপ্ন ও সত্য' (১৯৫১) 'বাজে লেখা'-র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ।

আত্মকথা : 'রূপনারায়ণের কূলে' (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭৮)। এটির তৃতীয় খণ্ডের সামান্য অংশ, 'পরিচয়' ও 'পাক্ষিক বসুমতী'-তে মুদ্রিত হয়। বইটি অসমাপ্ত।

ইংরেজি গ্রন্থ : 'Vidyasagar-A Reassessment' (১৯৭২), 'Quazi Nazrul Islam' (১৯৭২), গবেষণা-গ্রন্থ 'A Comparative Grammar of East Bengal Dialects' (১৯৮৬)।

হিন্দি : 'কাজী নজরুল ইসলাম' (১৯৬২), 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (১৯৬২)।

গোপাল হালদার বেশ কিছু উপন্যাস, সংকলন ও রচনা সংগ্রহের সম্পাদনাও করেছেন। সেগুলির তালিকা—'সোভিয়েট দেশ' (১৯৪১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বিষবৃক্ষ', 'সীতারাম' (১৯৫০) 'সোনার বাংলা' (১ম খণ্ড ১৯৫৬, ২য় খণ্ড ১৯৫৭, ৩য় খণ্ড ১৯৫৭), 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), 'দূর সুদূর (গল্প-সংকলন' : ১৯৬৬), 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড : ১৯৭২), 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৭৫), 'দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ' (১৯৭৩), 'কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ' (১৯৭৪), 'মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ১৯৭৪, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৫, ৫ম খণ্ড ১৯৭৬), 'Revolutionary Art : A Symposium'।

১.৩ গোপাল হালদারের প্রবন্ধ : সামগ্রিক পরিচয়

গোপাল হালদারের সাহিত্য-সত্তার ধর্ম ছিল মননশীলতা এবং মানবপ্রীতি। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন 'I am a man and I am interested in everything human', (তারিখ ১৯/৭/১৯৮৯; স্থান পাটনা। চিঠিটি লেখা হয়েছিল সুবীর চক্রবর্তীকে)। ওই চিঠিতেই তিনি বিশুদ্ধ কৌতুককে মানবপ্রীতি এবং মার্জিত বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্রকাশ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কমিউনিজমকে তিনি মানবতার প্রকাশ বলেই মনে করতেন। তাই কখনও সংকীর্ণ মত আবিষ্ট করেনি তাঁকে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যখন চিন্তন, গবেষণামূলকতা আর অনুভবসমৃদ্ধ রচনা—সর্ব শাখায় লাভ করেছে পূর্ণতা, তখনই গোপাল হালদারের প্রবন্ধ রচনার সূচনা। বিশ্লেষণপ্রবণতা চিন্তনগভীরতা এবং সহজবোধ্য অথচ ব্যঞ্জনাশক্তিসম্পন্ন ভাষা তাঁর বিচিত্রমুখী প্রবন্ধসমূহের বিশেষত্ব। গোপাল হালদারের প্রবন্ধ-সমষ্টিকে বুদ্ধিপ্রধান আলোচনা, অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ, রসনিবন্ধ আর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ—এই চার ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) **বুদ্ধিবৃত্ত প্রবন্ধ**—এই পর্যায়ে রয়েছে তাঁর সংস্কৃতি, সাহিত্য আর ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ। সংকলনগুলির নাম যথাক্রমে 'সাংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১), 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬)। এই তিন গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' নামে মুদ্রিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'একালের যুদ্ধ' (১৯৪৭)। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব সংস্কৃতি' (১৯৫৬), 'বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ' (১৯৮৩), 'সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮৩), 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর' (১৯৯১)।

'ভারতের ভাষা' (১৯৬৭), 'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' (১৯৭২) তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও সংস্কৃতি-বিশ্লেষক হিসেবেই গোপাল হালদারের খ্যাতি। সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সংকলন তিনটিতে তিনি সংস্কৃতির সামগ্রিক এবং দেশজ রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজ, সাহিত্য এবং ভাষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আর সমকালের সংস্কৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন গোপাল হালদার। সর্বোপরি ছিল গাঢ় মানবপ্রীতি। ফলে তাঁর সংস্কৃতি-বিশ্লেষণ হয়েছে সামগ্রিক ও সুষম। মার্কস বর্ণিত শোষক ও শোষিত—এই শ্রেণি বিভাজনের তত্ত্ব দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির রূপ। সংস্কৃতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেননি। মানব জীবনের সামগ্রিকতার মধ্যেই তিনি সন্ধান করেছেন সংস্কৃতির স্বরূপ। তাঁর বিশ্বাস 'সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া মানুষ হইতেছে প্রাচীন সংস্কৃতি হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।' বিশ্ব সংস্কৃতির পরিবর্তমানতা আর ভারত সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা মননদীপ্তিতে অনন্য।

'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থ দুটিতে গোপাল হালদার সমাজ-সচেতন মন নিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে ''বাঙালী সংস্কৃতির আসল কাঠামো (form) হওয়া চাই বাঙালী হিন্দু মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি''। প্রথম গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তবে উনিশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতির নব জাগরণ যে কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে সীমিত ছিল—এ সত্য তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বাঙলা সাহিত্য ও মানব সংস্কৃতি' ও 'বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ' সংকলন দুটিতে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে বিচার করেছেন। দুই ক্ষেত্রেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন মানবতাকে। সাহিত্যে, আধুনিকতা বলতে তিনি যথার্থই বুঝেছেন মানব-স্বীকৃতিই সাহিত্যে আধুনিকতার ভিত্তি। আর

বাংলা সাহিত্যে এ স্বীকৃতি দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকে বাংলার নব জাগরণের সময়ে। আংশিকতা সত্ত্বেও তার মূল্য স্বীকার করতেই হয়; এ সত্য স্পষ্ট হয়েছে তাঁর আলোচনায়।

'সতীনাথ ভাদুড়ী; সাহিত্য ও সাধনা' নামের মিতকায় সংকলনটিতে গোপাল হালদারের সাহিত্যমনস্কতার প্রকাশরূপ লক্ষিত হয়। তিনি লিখেছেন "সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য মানবসত্তার আত্মান্বেষণ। শিল্প তাঁর অন্বেষণের বাণীরূপ। তাঁর সাহিত্য তাঁর কালের তাঁর দেশের বিশেষ মানব আধারে সকল কালের সকল দেশের জীবন-সত্যের ও মানব-সত্যের স্বরূপ সন্ধান" ('সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' পৃ. ১১)।

'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে উনিশ শতকের নব জাগরণের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা—সব কিছুর সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'এ কালের যুদ্ধ' (১৯৪২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বিশ্ব-পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তাঁর সাংবাদিক সত্তার প্রকাশরূপ।

গোপাল হালদার ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে মিশেছে তাঁর মুক্ত চিন্তা। তার প্রমাণ ভারত ও বাংলার ভাষা সমস্যা নিয়ে রচিত 'ভারতের ভাষা' ও 'বাঙালীর ভাষা ভাঙালীর আশা' প্রবন্ধ-সংকলন দুটি।

'ভারতের ভাষা'-র পটভূমি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের ফলে উদ্ভূত জটিলতা। গোপাল হালদার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে মেনে নিতে সম্মত ছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। কারণ বহু ভাষা সমন্বিত দেশে এই জবরদস্তির ফলে হিন্দি-বিরোধিতা বৃদ্ধি পাবে। ভাষা হিসেবে হিন্দি ততটা উন্নতও নয়। তাঁর মতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হবে স্বাভাবিক বিকাশের পথে।

'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষার উন্নতির দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তবে প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যে গুরত্ব পায়নি সে সত্যের দিকেও তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থেও বাংলা আর ভারতের ভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। এসবই ভাষাতাত্ত্বিক গোপাল হালদারের প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।

(খ) অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ এবং সাহিত্যের ইতিহাস :

প্রাতিষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছিল গোপাল হালদারের প্রথম সাহিত্য ইতিহাস 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'র দুটি খণ্ড। গ্রন্থ দুটির বিশেষত্ব তথ্য-সংগ্রহে নয়, বিশ্লেষণ-গভীরতায়। তিনি প্রমাণ করেছেন সাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে জাতির আত্মবিকাশের ইতিহাস। দেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা আর রাজনীতির প্রতিফলন সাহিত্যে দেখা যায়। আবার সময়-পরিবর্তন সাহিত্যকেও পালটে দেয়। গোপাল হালদার নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সে পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং কারণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ম যে হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধ-প্রতিবাদের মাধ্যম—তা গোপাল হালদারই প্রথম স্পষ্টভাবে বলেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মুক্ত দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন গোপাল হালদার। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য জাতীয় চেতনার জাগরণের ইতিহাসচিত্র। কিন্তু সে জাগরণের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। সাধারণ মানুষ ও মুসলিমদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল সাহিত্যের দুর্বলতা। সে সত্য তিনি পাঠকদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' রচিত হয়েছিল তৎকালীন লেনিনগ্রাদ-এর পুশকিন ইন্সটিটিউট-এ ছয়মাস পড়াশোনার পর। রুশ সাহিত্যে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সংযোগ দেখেছিলেন তিনি। তা ছাড়া সে সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল জারতান্ত্রিক দুর্বল রাশিয়ার স্থলে সমাজতান্ত্রিক শক্তিমান রাশিয়ার উত্থানের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালি

পাঠকের পরিচয় করানোর জন্যই রচিত হয়েছিল 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা'।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির নব জাগরণের উৎস ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে সঞ্চারিত পাশ্চাত্য রেনেসাঁস-এর ভাবৈশ্বর্য। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ উপভোগের জন্যও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। এজন্যই রচিত হয়েছিল গোপাল হালদারের 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটি।

(গ) আত্মস্মৃতি : গোপাল হালদারের আত্মজীবনী 'রূপনারাণের কূলে'-র (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭৮, ৩য় খণ্ড ১৯৮৫) বিশেষত্ব নির্মোহ দৃষ্টিতে স্বদেশ ও স্বকালের ভাষাচিত্র অঙ্কন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সশস্ত্র ও অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম, কমিউনিজম-এর আত্মপ্রকাশ—প্রভৃতি ঘটনার সমন্বয়ে অসরল-দোলায়মান সময়ের ছবি এই তিন খণ্ড আত্মজীবনী। বিশ শতকের বাঙালি জীবনের রাজনীতি, সাহিত্য আর শিক্ষা জগতের উৎস-দলিল এই জীবনচিত্রত্রয়ী। ইতিহাস ও রাজনীতির সামাজিক চিত্রায়ন গ্রন্থ তিনটির বিশেষত্ব।

(ঘ) রম্য নিবন্ধ : প্রাণপ্রাচুর্য, ইতিহাস চেতনা আর সমাজদায়িত্বের সুষম অন্বয় দেখা যায় গোপাল হালদারের চরিত্রে। তাঁর রম্য নিবন্ধ-সংকলন তিনটি 'বাজে লেখা' (রচনা ১৯০৬, প্রকাশ ১৯৪২, সংশোধিত রূপ—'স্বপ্ন ও সত্য' ১৯৫১। এ থেকে বাদ পড়েছে 'বাজে লেখা'। যুক্ত হয়েছে 'সোনার কাঠি' আর 'সাধনা ও সৌখিনতা' নামের দুটি প্রবন্ধ)। 'আড্ডা' (১৯৫৬), 'বনচাঁড়ালের কড়চা' (১৯৬০)। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—প্রায় সকলেই লিখেছিলেন ব্যক্তি অনুভব প্রধান প্রবন্ধ। গোপাল হালদারের বিশেষত্ব মননশীলতা, সমাজচিন্তা আর প্রসন্ন জীবন-দৃষ্টির সুষম মিশ্রণ।

'বাজে লেখা'-র প্রবন্ধগুলি রচিত হয় বক্সা ক্যাম্প বন্দীশালায় ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে। কয়েকটি প্রবন্ধ প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখা। এ গ্রন্থের আলাপ আর স্বগত চিন্তার ভঙ্গিতে রচিত প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলাচল। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'আমার কলম অনুসরণ করেছে মনের ধারা, বুদ্ধির ধারায় তা চলেনি।' লেখকের শীলিত বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে। এ গ্রন্থে যেমন আছে 'কয়েদির আকাশ'-এর মতো কাব্যস্বাদী প্রবন্ধ তেমনই আছে 'মুদ্রাদোষ'-এর মতো শ্লেষমধুর নিবন্ধ।

'আড্ডা' (১৯৫৬) পুরোপুরি রস-নিবন্ধ সংগ্রহ। দশটি প্রবন্ধের এই সংকলনের পাঁচটির বিষয় বাঙালির আড্ডা দেশ-বিদেশের 'অবসর' বিনোদন-ব্যবস্থা প্রভৃতি। মননের সঙ্গে রস-উপভোগের সম্মিলন ঘটেছে বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন অবকাশ 'মুদ্রামূল্যে' ক্রয় করা যায়। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধের বিষয় বাংলা ও ফ্রান্স, গ্রিস, ইতালির ভোজনকলার বিশ্লেষণ।

'বনচাঁড়ালের কড়চা' ১৯৬০ সালে মুদ্রিত হলেও লেখা হয় তার আগে বন্দীশালায় বসে। গ্রন্থের নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বনচাঁড়াল নামের গুল্মশ্রেণির (বৈজ্ঞানিক নাম Hedsarun Gyrans) উদ্ভিদটির আলোকস্পর্শে স্পন্দিত হওয়ার বিশেষত্ব। এই স্পন্দন আলো চলে গেলেও কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে। জগদীশচন্দ্র বসু 'অব্যক্ত' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে বনচাঁড়াল নিয়ে করা তাঁর পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে বস্তুজগতের শক্তি কীভাবে জীব আত্মস্থ করে স্বশক্তিতে পরিণত করে তার বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

কারাগারে বন্দীর দিনযাপনের বিবরণ এই কড়চার বিষয়। লেখক বনচাঁড়ালের এই স্পন্দনরহস্য জানতেন। বন্দীজীবনে তাঁর সজীব মন পার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করে নিত সঞ্জীবন শক্তি। তাই তিনি লিখেছেন এ গ্রন্থ 'বনচাঁড়ালের চিৎস্পন্দনের অলক্ষ্য একটি ইতিবৃত্ত।' প্রবন্ধধর্মী লেখাও রসনিবন্ধের পাশে স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। 'বিদূষকের সঙ্গাসুখ' এ গ্রন্থের একটি উল্লেখ্য নিবন্ধ। সহবন্দীদের অভিনীত কমেডির আলোচনা সূত্রে রচিত নিবন্ধটি কমেডি সম্পর্কে তুলনাহীন একটি আলোচনা।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় গোপাল হালদারের মন ছিল প্রগতিশীল, মনন ছিল গভীর, মানবপ্রীতি ও প্রসন্ন

স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এইসব বিশেষত্বের প্রকাশ লক্ষিত হয় তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে। সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিও নয় তার ব্যতিক্রম।

১.৪ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : উৎস, পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য

'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' কোনো পৃথক গ্রন্থ নয়। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' নামে গোপাল হালদারের একটি গ্রন্থ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল বাংলার সংস্কৃতি জগতে। সেই গ্রন্থটির 'সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' নামক প্রথম ভাগ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' নামে পাঠসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মানবসংস্কৃতির বিপন্নতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন মানব-মানসের প্রেক্ষিতে রচিত হয় 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। ভূমিকায় গোপাল হালদার লিখেছেন—"নাৎসিবাহিনী তখন মস্কোর দুয়ারে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকের নিকট মনে হইয়াছিল অনিশ্চিত। বিশ্ব-সংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম। ..."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে শুরু হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে বহুল প্রচারিত এই গ্রন্থের প্রতি সংস্করণে বহু পরিবর্তন করেছেন লেখক। কিন্তু গ্রন্থের মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একনায়কতন্ত্রের প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ফলে রাষ্ট্রের নিকট মানবমূল্য হয়ে গিয়েছিল তুচ্ছ। হিটলার ঘোষিত তথাকথিত আর্য সংস্কৃতির শুদ্ধতা রক্ষার জন্য ইহুদি নিধন, জার্মান সংস্কৃতির প্রসারের জন্য জনক্ষয়কর যুদ্ধের ক্রমবিস্তৃতির প্রেক্ষিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ। সমূহ সর্বনাশের সম্মুখীন মুক্তবুদ্ধি প্রগতিমনস্ক মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এর বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে অনেক মনীষী দেখেছিলেন আশার আলো।

এই প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগে মানব-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করেছিলেন মানবতায় আস্থাশীল মুক্তবুদ্ধি মার্কসবাদী গোপাল হালদার। তিনি স্বীকার করেছেন প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণের গুরুত্ব। যুক্তি, তথ্যসহ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির স্বরূপ আর প্রমাণ করেছেন মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির অচ্ছেদ্যতার দিকটি।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' রচনার দ্বিতীয় একটি পরোক্ষ কারণও ছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পরে গঠিত হয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র। এই সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল মধ্য এশিয়ার নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির ছোটো ছোটো রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠী। সাম্যবাদ বলে মানুষে মানুষে সমতার কথা। তাই শাসনশক্তি সাম্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে যাওয়ায় বিশ্বের বহু মানুষ ভীত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই সব গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-বিশেষত্ব লুপ্ত হবে। আরও ভয় ছিল ব্যক্তিমনের সৃষ্টির উপর চলবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। সমতার আদর্শের ফলে সকলকেই সম শ্রমে নিযুক্ত হতে হবে। পরিণামে রাশিয়ার বহু যুগের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অস্তিত্ব মুছে যাবে।

এই সব আশঙ্কা থেকে উঠে আসে এই প্রশ্ন যে সংস্কৃতি কি কয়েক জন ধনী অবসরভোগীর অবকাশ যাপনের উপায় হিসেবে উদ্ভূত ও অনুশীলিত হয়ে থাকে? প্রাচীন সংস্কৃতির ক্রমানুশীলনই কি যথার্থ সংস্কৃতি? সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কি কোনো সংস্কৃতি নেই?

আবার প্রথম যুগের কিছু হঠকারী সাম্যবাদী যা কিছু প্রাচীন তাকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন; জোর করে শিল্পে-সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন সাম্য—এসবই অশুভের ইঙ্গিত দেয়।

এই জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদের প্রকৃত অনুসারী ও বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাসী মানবতায় আস্থাশীল বিদগ্ধ মনীষী গোপাল হালদার লিখেছিলেন 'সংস্কৃতির রূপান্তর'।

বৈশিষ্ট্য :

গোপাল হালদার সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী। মানবতায় ছিল তাঁর দৃঢ় আস্থা। কমিউনিজম তাঁর কাছে ছিল মানবতার এক নামান্তর। বিদগ্ধ এই মনীষী সংস্কৃতি নিয়ে কোনো গম্ভভীর গবেষণা করেননি। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তত্ত্ব তাঁর প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করেনি। তাঁর প্রবন্ধ মানবজাতির পরিবর্তমান আত্মপরিচয় ও আত্মানুসন্ধানের দলিল।

গোপাল হালদার ইতিহাস সচেতন মনোভাব নিয়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞাটিকে চিনে নিতে চেয়েছেন। তার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে গভীর মানবপ্রীতি। তাই 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর 'কথারম্ভ'-এর পরিচ্ছেদ শেষে পাই—'সংস্কৃতির অর্থ শুধু সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশী করিয়া মানুষ হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্বসংস্কৃতির রূপান্তর।"

ইতিহাসের অনিবার্য অগ্রগমনে বিশ্বাসী গোপাল হালদারের মতে মানবসংস্কৃতি পুরাতনের অনুবর্তন নয়—রূপান্তর। ইতিহাসের কোনো স্তরই অবজ্ঞেয় নয়। কারণ মানুষের প্রগতির জন্যই তার বিকাশ এবং বিবর্তন ঘটে। ইতিহাসের সেই স্তরপরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে মানবপ্রগতির ধারাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন লেখক।

গোপাল হালদার সাধারণ শিক্ষিত বাঙালিকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বানুসৃত সংস্কৃতির সংজ্ঞা। কারণ তিনি স্বীকার করেন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বা কমিটমেন্ট। তথাপি তাঁর রচনায় লক্ষিত হয় প্রকৃত জ্ঞানীর নিরভিমান সহৃদয় মনের প্রকাশ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সংস্কৃতির ভিত্তি সন্ধান করেছেন তিনি। তার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর সত্তার নিজস্বতা।

এত ব্যাপ্তভাবে সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা বাংলায় আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ মনীষী সংস্কৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনায় নেই বিস্তৃতি। শোষক ও শোষিত—দুই শ্রেণির মানুষের চিরকালীন অস্তিত্বের ভিত্তিতে সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি তাঁরা।

গোপাল হালদারের সমকালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু প্রমুখ বহু মনীষী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখায় নেই ধারাবাহিকতা।

ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ধারাবাহিকভাবে মানব-সংস্কৃতি নিয়ে সামগ্রিক আলোচনাই গোপাল হালদারের রচনার বিশেষত্ব।

১.৫ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' তিন খণ্ডে বিভক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের 'সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা' নামের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সংস্কৃতির গোড়ার কথা' পাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট। তার পূর্বে 'কথামুখ' নামের প্রথম অধ্যায়ে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে কমিউনিজম-এর মানবতা-পোষক দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ত্রুটিগুলিও তিনি দেখিয়েছেন—যা তাঁর সমদর্শী মনের পরিচায়ক।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রথম মুদ্রিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। পরে এর আরও সংস্করণ হয় এবং প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন লক্ষিত হয়। ব্যবহৃত সপ্তম সংস্করণের (১৯৬৫) 'কথামুখ' শুরু হয়েছে ১৯৬২

খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা অবরোধ দিয়ে। এই সময় চিন ভারত আক্রমণ করে। দুটি ঘটনাই বিশ্বকে উত্তেজিত, শঙ্কিত করে। কিন্তু মস্কো তথা রাশিয়ার জনগণ শান্ত স্থিরতার সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছিল পরিস্থিতির। মূলত রাশিয়ার স্থিরতার জন্যই যুদ্ধ শুরু হয়নি। বাস্তব এই পরিস্থিতি আর রুশ জাতির অবস্থা বিশ্লেষণ করে গোপাল হালদারের সিদ্ধান্ত "...কমিউনিজম্ এ যুগের মানবতার নাম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই মানবসত্যের বাস্তব রূপায়ণই এই যুগের সংস্কৃতির, তাহার অধ্যাত্ম চেতনার প্রাণ-সম্পদ। সোভিয়েত সেই মানব সত্যকেই পরম মূল্য দেয়—এই কথাই কুবার সংকট-উপলক্ষে বিশ্বের মানুষের সম্পর্কে প্রকটিত হইয়া গেল। ...যদি এই মানব সত্যকে সোভিয়েত রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের ইতিহাস তাহার দান—তাহার সমস্ত সফলতা নিস্ফলতার উপর জয়ী হইবে, কমিউনিজ্‌মও 'মানবতার ধর্ম' বলিয়া স্বীকৃত হইবে।"

'ধ্বংস নয়—Not to Destroy But to Fulfil' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন রুশ জনতা অভাবমুক্ত হয়ে ভোগের নেশায় মাতেনি। তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব উন্নতির কর্মে ব্যাপৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের অবিচল সংগ্রাম প্রমাণ করেছে শোষণ-মুক্ত সমাজেই দেশপ্রীতির সম্যক বিকাশ সম্ভব।

সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বজনীন বিকাশ ঘটাতে পেরেছে; প্রতি মানুষের স্বাধীন সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করেছে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাই আর্থিক পরিকল্পনার সাহায্যে মানুষকে আপন উন্নতি সাধনের দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিন্যাস ও বিজ্ঞানের সুষম বিকাশে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার দ্বারা মানব-উন্নতির কর্মে পথপ্রদর্শক হয়েছে। গৃহযুদ্ধ, বিদেশি আক্রমণ, অর্থসংকট, বণিকতন্ত্রের ষড়যন্ত্র, ফ্যাসিজম্-এর আক্রমণ, নিজেদের ভুল—এসব সত্ত্বেও সোভিয়েত রাষ্ট্রের উন্নতি রুদ্ধ হয়নি। তাই গোপাল হালদার বুঝেছিলেন কমিউনিজম চালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব। তাঁর মতে 'সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞানের সাধনা' আর 'সার্বজনীন মানবতার সাধনা'—এই দুটিতেই সোভিয়েত সংস্কৃতির আসল পরিচয় প্রকাশিত। বিপ্লবের সর্বকালীন বাণী 'আই কাম টু ফুলফিল, নট টু ডেস্ট্রয়' ('I come to fulfil, not to destroy')।

'বিজ্ঞান ও বিশ্ববিপ্লব' পরিচ্ছেদে গোপাল হালদার বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান কেমন করে হয়ে উঠেছে মানবমুক্তির সহায়ক। বিদ্যুৎ ও পেট্রল আবিষ্কার, অ্যাটমিক শক্তির আবিষ্কার ক্রমে মানুষকে শ্রমনির্ভরতা থেকে দিয়েছে মুক্তি। ফলে মানুষের চিন্তাজগৎ হয়েছে সমৃদ্ধ। উন্নত চিন্তার প্রভাবে শোষিত মানব শোষক শ্রেণির স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, খুঁজে পেয়েছে সংগ্রামের পথ।

আবার পারমাণবিক শক্তির প্রসারের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর সোভিয়েত শক্তির অ্যাটমিক শক্তিলাভ) ফলে যুদ্ধ প্রবণতা সংকুচিত হয়েছে। তাই বলা যায় বিজ্ঞান এনেছে বিপ্লব। যার ফলে মানুষের জাতিগত একাধিপত্য চূর্ণ হবে; কোনো বিশেষ জাতির স্বার্থে মানবজাতির ধ্বংস হবে না।

বিজ্ঞানের আর একটি বিশেষত্ব সে পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে দূরত্ব লুপ্ত করেছে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর রুশ উপগ্রহ স্পুৎনিক-এর মহাকাশ যাত্রা ও ১৯৬১ তে প্রথম ভোস্তক-এর মহাকাশ পরিক্রমা বিশ্ব বিপ্লবের আর একটি ধাপ। কারণ এর ফলে মহাবিশ্ব থেকে পৃথিবীকে মানব বাসস্থান হিসেবে দেখা যায়। সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে মনে জাগে বিশ্বমানের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধ। বিপ্লবের অর্থ আমূল রূপান্তর। রাষ্ট্রীয় শক্তি দখল ব্যতীতও নানাভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরে পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ঘটে থাকে।

প্রবন্ধ রচনার সমকালে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ক্রমশ নানা দেশে রাষ্ট্রশক্তি দখল করেছিল। ফলে সমাজতন্ত্রের ক্রমবিস্তৃতি এবং তার ফলে মানবমূল্যবোধ বৃদ্ধি সম্পর্কে আশা পোষণ করেছিলেন লেখক। তাঁর আশা ছিল এর ফলে দেশে দেশে সাধারণ শ্রমজীবীরা রাষ্ট্রশক্তির চালক হবে, আর্থিক বিষয়ে ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের মালিকানা স্বীকৃত হবে; বুদ্ধিজীবীগণ সমাজতন্ত্রস্বীকৃত দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে মানবিক মূল্যবোধ বিস্তৃত হবে।

এই পরিবর্তন দেশভেদে হবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

এরপরে গোপাল হালদার যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন ধনতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ছে; তার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া বিশেষত কৃষ্ণ আফ্রিকার বহু দেশের স্বাধীনতা লাভ। এসব দেশে সমাজতন্ত্রবাদ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও সব দেশে তা সমান গুরুত্ব পায়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হয়েছে। এখন চলছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুগ।

সাম্রাজ্যবাদ এখন রাজনৈতিক অধিকারের পরিবর্তে আর্থিক শোষণ-শাসন চালাতে চাইছে। 'সাহায্য' দান ও পুঁজি লগ্নি করা তার এক রূপ; অন্য রূপ জোটবদ্ধতা, যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধ-আতঙ্কের প্রসার, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা। নাটো, সিয়াটো প্রভৃতি চুক্তি তার প্রমাণ।

গোপাল হালদারের মতে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রী দেশ সমূহ এবং এশিয়ার ধনতন্ত্রী দেশ জাপান—বিশুদ্ধ শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিমান। ছবিতে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে, নাটক, নৃত্যকলার দিক থেকে এসব দেশের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এইসব শিল্পের সঙ্গে জীবনের যোগ নেই। সেজন্যই এদের দুর্বলতা দূর হয়নি। শিল্প কখনও শুদ্ধমাত্র শিল্প নয়। জীবনের সাধনাতেই তার সার্থকতা। অন্যদিকে লেখকের মতে শিল্প ও জীবনের অন্বয়ের আধিক্য সোভিয়েত শিল্পের রসোত্তীর্ণ না হওয়ার কারণ। তবে মানবতার দিকে লক্ষ রেখেছে সোভিয়েত দেশ। তার বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি—সব কিছুরই মূল মন্ত্র মানবতার প্রতি আনুগত্য। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা বা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আরও নিষিদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের জাতি, ধর্ম বা অন্য কোনো বিভেদ প্রচার। সে কারণে সোভিয়েত রাষ্ট্রে বর্ণজনিত বৈষম্যও নিষিদ্ধ।

তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকা, এশিয়ার তরুণদের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি বিজ্ঞান শিল্পবিদ্যার সুব্যবস্থা আছে। এ কারণে বিবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে নির্দ্বিধায়। এর উপর আছে 'এশিয়ার লোকজীবন পরিষদ' ও 'আফ্রিকার লোকজীবন পরিষদ'। এই দুটি পরিষদের মাধ্যমে সে চেষ্টা করেছে পৃথিবীর সব জাতির ভাষা, সাহিত্য, আধ্যাত্মিক সম্পদের সম্যক পরিচয় লাভের। ইউরোপেয় বহু দেশের তুলনায় সোভিয়েত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল। তথাপি সোভিয়েত রাষ্ট্র বিনা শর্তে এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা দান করে। এসবই তার মানবতায় বিশ্বাসের প্রমাণ।

'মুনাফার পলিটিক্স্ ও মানবতার পলিটিক্স্' পরিচ্ছেদে গোপাল আলোচনা করেছেন কমিউনিজম প্রচারই সোভিয়েত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—এই মতের। লেখক তা স্বীকার করে বলেছেন সাম্রাজ্যবাদও অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গঠন করেছিল British Society of Oriental and African Studies। কিন্তু এসব দেশের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর আলোচনার কোনো প্রয়াস পৃথকভাবে করেনি। কারণ তাদের মনে কাজ করেছিল লাভের কামনা। আর সোভিয়েত দেশের কাম্য মানুষের সার্বিক উন্নতি। অর্থাৎ তার রাজনীতি মানবতার রাজনীতি।

সোভিয়েত দেশের নিজস্ব ত্রুটি-দুর্বলতা আছে। তথাপি সে মানুষের সার্বিক উন্নতি চায়। তার বিজ্ঞানসাধনা, তার বিশ্বশান্তির প্রয়াস সবই তার মানবতায় বিশ্বাস ও সমুন্নতি-প্রয়াসের প্রমাণ।

পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার ও সে শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সমগ্র মানবজাতিকে এক দিকে পূর্ণতার পথ দেখিয়েছে; অন্যদিকে সার্বিক বিনাশের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত দেশ শান্তির জন্য চেষ্টা করে চলেছে। কারণ তার সাধনা মানবতার সাধনা : আর এই সাধনাতেই সংস্কৃতির মহত্তর রূপ আত্মপ্রকাশ করে।

১.৬ সংস্কৃতির গোড়ার কথা

'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নাম 'সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা'। এই খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বারোটি শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদে লেখক গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এবং তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে।

'সংস্কৃতির গোড়ার কথা' নামের প্রথম পরিচ্ছেদে গোপাল হালদার সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ত্রুটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কৃতির প্রচলিত সংজ্ঞা।

সংস্কৃতি বিষয়ে সাধারণ ধারণা ততটা স্পষ্ট নয়। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানই সংস্কৃতি—এমন ধারণা অনেকেরই আছে। কারও ধারণা আচার, আচরণ, ভদ্রতা, শিষ্টতাই সংস্কৃতি। অনেকে বলেন ধর্মই সংস্কৃতি। এই মতভেদ আছে বলেই সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞা স্থির করা প্রয়োজন।

বাংলায় 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। 'কৃষ্টি'—শব্দটির বৈদিক অর্থ সমুদয় কৃষকদল। সেটিও 'কালচার'-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল কিছুকাল। ব্যবহারটি ভুল ছিল না। তথাপি 'কালচার' অর্থে আর এক বৈদিক শব্দ সংস্কৃতিই অধিক প্রচলিত। কারণ শব্দটির মধ্যে মানুষের কৃতির বা সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত আছে। সংস্কৃতি মনের বিনাশ, বা কেবলমাত্র মানসসম্পদ নয়। মানুষের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে তার উদ্ভব। সংস্কৃতি থেকে মানুষ পায় জীবন-সংগ্রামের শক্তি। জীবনের বাস্তব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যই তার আবির্ভাব। আবার জীবনযাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সংস্কৃতির প্রকৃতি পালটে যায়। সংস্কৃতি জীবনের পরিবর্তনের সহায়ক। সেই পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃতিরও ঘটে পরিবর্তন। অর্থাৎ সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাই সে সচল এবং পরিবর্তনশীল তার রূপ।

সংস্কৃতির পরিবর্তনের নিয়ম এবং সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব কাকে বলে—তা জানা সংস্কৃতি আলোচনার অন্যতম ভিত্তি। তাহলে সংস্কৃতির রূপ আর কোন কোন বিষয় অবলম্বনে সে রূপ গড়ে ওঠে—সেটি যেমন জানা যায় তেমনই উভয়ের সম্পর্ক হয়ে ওঠে স্পষ্ট।

ইতিহাসের গতির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বুঝে নেওয়া চাই। তা হলেই সংস্কৃতির রূপান্তর ধারাটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সংস্কৃতির অধিকারী কেবলমাত্র মানুষ; অন্য কোনো জীবের সংস্কৃতি নেই। কারণ সব জীবের মতো মানুষেরও জীবনের মূল কথা বেঁচে থাকার, টিকে থাকার অবিরাম প্রয়াস। কিন্তু সে চায় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন যতটা সম্ভব সহজ ও আনন্দময় করতে। জীবিকাকে আয়ত্ত করার এই প্রয়াসই পরিশ্রম। এটাই তার সভ্যতার ভিত্তি। তাই সংস্কৃতির মূল শ্রমশক্তি আর অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলনে-বিরোধে মানবপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যের সাধনা।

অন্য সব জীব প্রকৃতির নিয়মের অধীন হয়ে বাঁচে, মরে। তাই তাদের সংস্কৃতি নেই। মানুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক হতে চায়। মানুষের এই স্বতন্ত্রতার সাধনার আছে নানা স্তর। তাই সংস্কৃতিরও ঘটে রূপান্তর? 'সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ' অধ্যায়ে গোপাল হালদার সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাসমূহের ত্রুটি স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। সাধারণত সংস্কৃতি বলা হয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন বিজ্ঞান-প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যাকে। আবার দেশ, কাল, ধর্ম, জাতি দিয়েও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যার মনোভাব বেশ প্রবল। যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্যযুগের সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি প্রভৃতি। আরও আছে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, জড়বাদী সংস্কৃতি প্রভৃতি পৃথক নাম।

সংস্কৃতি বিচারের এইসব পদ্ধতি পুরোপুরি অবজ্ঞেয় নয়। আবার এদের যুক্তিসম্মতও বলা যায় না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে হিন্দু সংস্কৃতি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতিও বোঝায়। তথাপি এরূপ নাম দেওয়ার কারণ জনতার যৌথ অহ্ম এর ফলে তৃপ্ত হয়। কিন্তু এর কুফল হল মানুষ বিস্মৃত হয় সংস্কৃতির ব্যাপ্তি অর্থ; তার মনে আসে জাতিগোষ্ঠীর রক্তনির্ভর সংস্কৃতির অবৈজ্ঞানিক ধারণা। সংস্কৃতি সম্পর্কে এইসব ধারণাকে বলা যায় অর্ধসত্য এবং আপেক্ষিক। কারণ ঘটনা-সংঘাতের ফলে তা পালটে যায়। জীবনযাত্রার সৌকর্য সাধনেও এধরনের সংস্কৃতির তেমন কোনো প্রভাব থাকে না। প্রকৃতির উপর মানব অধিকার বিস্তারের কোনো দিক এই সংস্কৃতি-ধারণা-সমূহ উদ্ভাসিত করে না।

যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির অর্থ মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের পূর্ণ প্রচেষ্টা। তার ভিত্তি বেঁচে থাকার প্রয়াসকে সহজ করার প্রয়াস।

বেঁচে থাকার চেষ্টার মধ্যে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিই প্রকাশিত। জীব মাত্রেরই আছে এ প্রচেষ্টা। কিন্তু মানুষের প্রয়াস কেবল প্রকৃতি নির্ভরতায় সীমিত নয়। প্রকৃতিকে অধিকার করে সে ছিনিয়ে আনে বাঁচার উপকরণ। তার এই চেষ্টাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতি জয়ের ধরন পরিবর্তিত হয়। তাই সংস্কৃতিরও ঘটে বর্ণান্তর। কিন্তু ধীরতা হেতু সহজে তা বোঝা যায় না। তবে এক যুগের শেষে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন—আসে বিপ্লব। তখন সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। এভাবেই সভ্যতা এগিয়ে যায়—পশুচারণজীবী মানুষ হয় কৃষিজীবী। কৃষিনির্ভরতার পরে আসে শিল্পযুগ।—প্রকৃতিকে জয় করার যুগ। স্টিম ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে জলে-স্থলে-আকাশে—প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার জয়যাত্রা। কিন্তু সে যাত্রার বিস্তৃতি সত্ত্বেও এখনও প্রকৃতির বিপুল শক্তি মানুষের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে।

মানুষ একই সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গ আর প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রকৃতির সঙ্গে অবিরত চলে তার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সে পালটে দিতে পারে এবং দেয়ও। ফলে সভ্যতা বদলে যায়; সংস্কৃতি লাভ করে নতুন রূপ।

'রূপান্তরের মূলতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে গোপাল হালদার লিখেছেন জানতে হবে এই পরিবর্তনের নিয়ম। নতুবা অ-বোধ্য থেকে যাবে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপান্তরের পন্থা। বোঝা যাবে না কেন ফ্যাসিজম পরাস্ত হয়, জয় হয় সোভিয়েত-এর; জয়ী হয় কমিউনিজম—তৎকালীন পরিস্থিতিতে যাকে মানবতার মূর্ত রূপ বলেই দেখেছিলেন লেখক। এই মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগ্রাম থেমে যায় না কোনো দিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সদ্য স্বাধীন এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতে দেশ ভাগ, শর্তকণ্টকিত অর্থ সহায়তা দান, অ্যাটমিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের মাধ্যমে চলেছে তার আগ্রাসন।

সংস্কৃতির রূপান্তরের মূল তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। কিন্তু সে তত্ত্ব জানা থাকলে সংস্কৃতির বিপদের প্রকৃতি সহজে বোঝা যাবে; বিশ্লেষণ করা যাবে ইতিহাসের যথার্থ প্রবাহ আর সংস্কৃতির অন্য রূপ গ্রহণের প্রকৃতি।

গোপাল হালদারের মতে জীবনের ভিত্তি বস্তু। আর বিজ্ঞানের মতে বস্তু গতিশীল। কারণ প্রতি বস্তু গঠিত বহু কণা দিয়ে। আর কণাগুলি নির্মিত প্রোটন-কেন্দ্রিক ইলেকট্রনের আবর্তনের ভিত্তিতে। এছাড়া আছে নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি অসংখ্য কণা; সেগুলিও গতিময়। 'বিজ্ঞানের সাক্ষ্য' পরিচ্ছেদে এই গতিশীল কণা কেমন করে বস্তুর রূপ পরিবর্তিত করে তার উদাহরণ দিয়ে জগৎপ্রবাহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক।